IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সমকালীন প্রেক্ষিত

ড০ বরুণজ্যোতি চৌধুরী

সহযোগী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালে, তার প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘদিনের। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারের তাজা রক্তের বিনিময়ে এবং তাদের সর্বাত্বক আত্মবলিদানে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ মাতৃভাষার অধিকার অর্জন করেন। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিপরীতে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের উত্থান ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীতে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশের পেছনে মূলত তিনটি কারণ ছিল – ১) হাজার বছরের লোকায়ত ঐতিহ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, ২) প্রতীচ্যের উৎসজাত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শ, মানবিক চিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতা, ৩) সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উৎস থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার শিক্ষা ও মূল্যবোধের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। মুক্তিযুদ্ধের আঘাত সমগ্র বাংলাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল –

> *"২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশে কেউই নিরাপদ ছিল না, তবে আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক আর হিন্দু ধর্মালম্বীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এরকম তরুণেরাও সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মাঝে ছিল কমবয়সী মেয়েরা। সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বাংলাদেশের বিহারি জনগোষ্ঠীও বাঙালি নিধনে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ভয়ংকর অত্যাচারে এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী পাশের দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘ কিংবা নিউজ উইকের হিসেবে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যাই ছিল মাত্র সাত কোটি- যার অর্থ দেশের প্রতি সাতজন মানুষের মাঝে একজনকেই নিজের দেশ ও বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।*

ভারত এই বিশাল জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপের মাঝে পড়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আগরতলায় মোট অধিবাসী থেকে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। শরণার্থীদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের, খাবার অভাব, থাকার জায়গা নেই, রোগে শোকে জর্জরিত, কলেরা ডায়রিয়া এরকম রোগে অনেক মানুষ মারা যায়। ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধ শেষে কোনো কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে একটি শিশুও আর বেঁচে নেই।"[১]

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চেতনায়, মানসিকতায় ছিল মানবিকতাবোধ, মানুষকে ভালোবাসা তার মূল কথা ছিল । গ্রহণ-বর্জনের বৈজ্ঞানিক রীতি মেনে ওপার বাংলার মানুষ চেতনায় ধারণ করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে । প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শকে স্বীকৃতি দিয়েই পুষ্টি লাভ করেছে ওই দেশের লোকায়ত ঐতিহ্য, সেজন্য সেখানে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল । আর এই প্রগতিশীল জাতীয়তাবোধ সে দেশের মানুষকে মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় প্রেরণা যুগিয়েছে । শুধুমাত্র মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন । ভাষাকে কেন্দ্র করে একটা জাতির জাগরণ সম্ভব হয়েছিল কারণ তারা চেতনায় প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদকে লালন করেছিলেন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ওপার বাংলার মানুষ জয়লাভ করেছিলেন এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিলেন, যে দেশের রাষ্ট্রভাষা হল বাংলা । তবে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান দিয়ে নানাভাবে ভারতবর্ষের মানুষেরা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন । সে দেশের গৃহহীন স্বজনহারা নিগৃহীত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষ । স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম অনেকটা ত্বরান্বিত হয়েছিল আর এটা সম্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষ পাশেই ছিল বলে । এই ঘটনার অভিঘাতে পরবর্তীকালে সেদেশের বাংলা সাহিত্যেও নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল । মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের উপন্যাস ভাবনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে । মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক যে চেতনা ছিল তা উপন্যাসের পাতায় বারবার ধরা পড়েছে । মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন মানুষ অপর মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । তারা বলেছিলেন 'মানুষ বড় কাঁদছে মানুষের পাশে দাঁড়াও', আর এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাই সে দেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেছিল –

"১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সারা পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড়ো বড়ো জেনারেলের রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি, তাই দলগুলো নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি আর কোন্দল করতে থাকবে আর সেটিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থেকে দেশটাকে লুটেপুটে খাবে। কাজেই নির্বাচনের ফলাফল দেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ফলাফলটি ছিল অবিশ্বাস্য- পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনের ভেতরে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী

লীগ বিপুল ভোটের ব্যবধানে ১৬০টি আসন পেয়েছে। যখন সকল আসনে নির্বাচন শেষ হলো তখন দেখা গেল, মনোনীত মহিলা আসনসহ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপল্স পার্টি ৮৮টি এবং অন্যান্য সব দল মিলে পেয়েছে বাকি ৫৮টি আসন।

সোজা হিসেবে এই প্রথম পাকিস্তান শাসন করবে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ । বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার করে বলে দিলেন, তিনি ছয় দফার কথা বলে জনগণের ভোট পেয়েছেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র রচনা করবেন ছয় দফার ভিত্তিতে, দেশ শাসিত হবে ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, কোনোভাবেই বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের শাসনভার তুলে দেয়া যাবে না। নিজের অজান্তেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর তার দলবল 'বাংলাদেশ' নামে নতুন একটি রাষ্ট্র জন্ম দেবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল।"[২]

১৯৪৭ সালে দেশভাগের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় । আর তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা । শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী পদে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষেরাই আসন দখল করে রাখেন, ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল সমাবেশের মধ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, আর সেখান থেকেই বাঙালিদের মনের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম হয় । রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শুধুমাত্র উর্দু হলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটে পড়বে । আর সেজন্য পূর্ব পাকিস্থানে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পায় । বাঙালিরা উপলব্ধি করতে পারেন পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের হাতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব সংকটে । ভুক্তভোগী বাঙালিদের মধ্যে দিনে দিনে ক্ষোভের আগুন বাড়তেই থাকে । পাকিস্তানে তখন মুসলিম লীগ, ছাত্রলীগ, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ । ১৯৫২ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে অবহেলা করার নিন্দা জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয় তীব্র গণআন্দোলন । সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এই আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তারা আওয়াজ তোলেন তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন । ওই সভাতেই একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারা বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয় জোরদার ধর্মঘট । ওই ধর্মঘটে ছাত্র-ছাত্রীরা জড়িয়ে পড়লেন আর তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন শিক্ষক বুদ্ধিজীবী মানুষ । পোস্টার ব্যানারে ঢাকা শহর ছেয়ে যায় । সাধারণ মানুষের ক্ষোভের আগুনকে প্রশমিত করার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেন । ঢাকা শহরে বাঙালিদের বিরুদ্ধে সেনা নিয়োগ করা হয় । বিক্ষুব্ধ জনতাকে দমন করতে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে থাকে । পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সে সময়ে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এই চারজন তরতাজা যুবকের মৃত্যুতে মানুষ আরো প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন । বিক্ষুব্ধ জনতাকে দমন করতে পুলিশ গুলি চালানো শুরু করে । এই চারজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে

আন্দোলনের ঢেউ। এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আইন পরিষদের ভেতরেও। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে পরিষদের কক্ষ ত্যাগ করেন। এর পরের দিন মিছিলে সরকারি কর্মচারী সহ ছাত্র-যুবক মানুষেরা যোগদান করেন। ক্ষোভের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দেখতে দেখতে। তৎকালীন বাংলাদেশ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। প্রায় প্রত্যেকে মনে করেন আমরা প্রাণ দেবো তবু বাংলা ভাষাকে বাঁচাব। হিন্দু-মুসলিম সবাই এক হয়ে সেদিন পথে নামেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন সমগ্র পৃথিবীকে দেখিয়ে দিল ভাষা প্রেম কাকে বলে। জাফর ইকবাল যথার্থই বলেছেন –

> *"অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড়ো নিপীড়ন হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়ন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ঠিক সেটিই শুরু করেছিল। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে আর ঠিক ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের . করে শুরু বিক্ষোভ করে বাদপ্রতি তার বাঙালিরা পাকিস্তানের পূর্ব সাথে সাথে রাষ্ট্রভাষা। দিল। আন্দোলনকে থামানো যায়নি, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। যেখানে আমাদের ভাষাশহীদরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেখানে এখন আমাদের প্রিয় শহীদ মিনার, আর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি শুধু বাংলাদেশের জন্যে নয়, এখন সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।"*[৩]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরাতন ব্যবস্থার বিদায় প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, এবং এর পাশাপাশি ছিল যুদ্ধের গভীর প্রতিঘাত। দেশবিভাগের ক্ষত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের দুর্ভোগ সমাজের কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। পুরানো ও নতুনের সংঘাতে সমাজ নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। পুরাতন মূল্যবোধ, গুরুবাদ, এবং অতীতের রক্ষণশীল ধ্যানধারণা ক্রমশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ শুরু হল। মানুষ মানবিকতা হারিয়ে যন্ত্রে পরিণত হতে থাকে, প্রযুক্তি ও আধুনিকতার হাতছানিতে মানুষ তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য, মানবিকতা ও মমত্ববোধকে বিসর্জন দেয়।

জনশক্তির ক্রমবিকাশ ও শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার শহর ও গ্রামের মানুষের মধ্যে এক সুস্পষ্ট ব্যবধান তৈরি করে। একদিকে শহরের চাকুরিজীবী শ্রেণির উত্থান, অন্যদিকে গ্রামীণ কৃষিজীবী শ্রেণির টিকে থাকার সংগ্রাম, এই দুইয়ের মধ্যে বৈষম্য দিনকে দিন বাড়তে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করে, যাদের জীবনে নতুন ধরনের চাহিদা ও জীবনধারা প্রবেশ করে। বিশ শতকের শেষদিকে এসে, কিশোর-কিশোরীরা মাটির পুতুল নিয়ে খেলা করার পরিবর্তে তাদের হাতে তুলে নেয় ভিডিও গেম, কিন্ডার জয়, টিভির রিমোট কন্ট্রোল, কম্পিউটারের মাউস।

এই প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে। মানুষ পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিজেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে। আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিস্বার্থের বদ্ধ পরিবেশে মানুষ একাকিত্বে

ভুগতে থাকে। 'আমাদের নিজের মুদ্রাদোষে' আমরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকি, প্রত্যেকেই যেন নিজেদের ছোট ছোট দ্বীপে আবদ্ধ হয়ে পড়ি, আর সমাজের গভীরে বাসা বাঁধে নিঃসঙ্গতা।

নকশালবাড়ি আন্দোলন বাংলার সমাজ পরিসরে আলোড়ন তুলেছিল :

> *"নকশাল আন্দোলন কলকাতার ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। ছাত্রদের একটি বড় অংশ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। বিশেষত নাম করা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা প্রভাবিত হয়েছিল এই আন্দোলনে। চারু মজুমদার বলেছিলেন বিপ্লবী কার্যক্রম শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলে চালিয়ে গেলেই চলবে না, বরং একে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি নকশালদের শ্রেণীশত্রু খতম করার নির্দেশ দেন। এ শ্রেণীশত্রুদের মধ্যে যেমন ছিল ভূস্বামী তেমনি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পুলিশ অফিসার, রাজনীতিবিদ এবং আরও অনেকে।*
>
> *সে সময় কলকাতার সব স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নকশালপন্থী ছাত্ররা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নিয়ে তার মেশিন শপে পুলিশদের সাথে লড়ার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল তাদের সদর দফতর। তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ গোপাল সেন কে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল।*
>
> *নকশালরা অল্পসময়ের মধ্যে ভারতের শিক্ষিত সমাজের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। দিল্লীর "সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ" তাদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।*
>
> *এরপর সরকার নকশালদেরকে শক্ত হাতে দমনের সিদ্ধান্ত নেয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় নকশালদের উপর প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দেন। পুলিশকে কিছু মানবতা বিরোধী ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল নির্বিচারে হত্যা এবং অকারণে যে কাউকে বন্দী করার ক্ষমতা। লক-আপ হত্যা, জেলবন্দী হত্যা ও ভূয়ো সংঘর্ষ দ্বারা পুলিশ বিভিন্ন সময় নকশালপন্থীদের হত্যা করেছে। এক মাসের ভেতরে সরকার নকশাল আন্দোলন দমন করেছিল। নকশালদের শক্ত হাতে দমন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ভারত সরকার এবং পুলিশের মনোভাব ছিল এমনি। তারা দেশের জনগণকে এ কথাও ভাল ভাবে বুঝিয়েছিল যে দেশ এখন ঐ চরমপন্থীদের সাথে গৃহযুদ্ধে নেমেছে, এ যুদ্ধে গণতন্ত্রের নামে পরিহাসের কোন স্থান নেই। কেননা ঐ চরমপন্থীদের কাছে গণতন্ত্র মূল্যহীন। এর ফলে দেশবাসীর কাছে নকশালদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়, আর তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।"*[৪]

নকশাল আন্দোলনের পরবর্তী সময় থেকে আধুনিক পৃথিবীর ধাক্কায় আমাদের প্রেম, বন্ধুত্ব, হৃদয়াবেগ মিথ্যায় পর্যবসিত হল । মানসিক দারিদ্রতায় আমরা ভুগতে শুরু করলাম । সুবিধাবাদ, স্ববিরোধিতা, মিথ্যা অহংকার, চতুর স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা, আত্মপ্রতারণার এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করলাম । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি সুবিধাবাদ, হলুদ সাংবাদিকতার অত্যধিক প্রচার, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে দালাল শ্রেণির

যোগাযোগ, ভোট সর্বস্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাজার হাজার বেকারত্ব গ্রামের ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষদের শোষণ করতে থাকল। বিশ শতকের শেষদিকে এসব ঘটনাবলি মানুষকে আরো অন্ধকারে নিমজ্জিত করে তুলছে। জীবিকার সন্ধানে গ্রামের হাজার হাজার মানুষ শহরে পাড়ি জমাতে শুরু করেন, শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা চাকরির সন্ধানে বিভোর হয়ে ঘুরতে থাকেন, শিল্পায়নের ফলে একদিকে কাজ পাওয়া, অন্যদিকে কাজ হারানো, সমাজের এক বহুল টালমাটাল পরিস্থিতি দেখে দেখে ৭০-৮০ দশকের মানুষেরা বড় হতে শুরু করেন। উদার সাম্রাজ্যবাদের সময় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজার দখলের লড়াইয়ে সাধারণ গ্রামের মানুষেরা বিধ্বস্ত হতে শুরু করেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি শহর পেরিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যেও প্রবেশ করতে শুরু করে। বেসরকারীকরণ-এর ফলে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার শুধু শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেই আটকে থাকেনি, গ্রামের মানুষেরা দীর্ঘদিন শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে থেকে যান।

পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে শুধু কমিউনিস্ট আন্দোলন নয়, বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল এই আন্দোলন। ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির ফাঁক ও ফাঁকিকে সকল মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছিল এই আন্দোলন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পরে বাংলা উপন্যাসে আমরা গ্রামকে পাই এক নতুন আঙ্গিকে। গ্রামীণ মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের আবেগঘন মুহূর্ত, গ্রামের মানুষদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা বাংলার লেখকদের লেখায় উৎসাহ জুগিয়েছিল। বাংলা উপন্যাসে গ্রাম নতুনভাবে উঠে এলো। গ্রামের মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের নির্বিচারে শোষণ করা শুরু হল, এসব ঘটনাকে কলমের তুলির টানে খুব সুন্দর ভাবে অঙ্কন করেছেন দুই বাংলার লেখকেরা। শহরের দমবন্ধ করা পরিস্থিতির বাহিরেও রয়েছে গ্রামের সুস্থ-স্বাভাবিক সরল জীবনযাপন। শহরের প্রাচুর্যের বাইরে রয়েছে গ্রামের সহজ সরল জীবনযাপন। হাতের লেখায় ফুল-ফল, প্রকৃতির মনোরম স্পর্শ, নীল আকাশ, সবুজ মাঠ মেশানো গ্রাম জীবনের ছবিকে নিয়ে আসে সামনের সারিতে। নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসে স্থিত এইসব লেখকেরা গ্রাম্য জীবনের জীবনধারাকে নিয়ে এলেন উপন্যাসের পাতায়। সাধারণ মানুষের, শোষিত মানুষের, জয় ঘোষণা করে অত্যাচারিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন ঔপন্যাসিকেরা। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের কৃষকদের করুণ অবস্থা। অগণিত ক্ষেতমজুরদের এককথায় দরিদ্র মানুষদের নির্বিচারে শোষণ করা হয়েছে তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে। সত্তরের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে কৃষকদের বেদনা, বঞ্চনা ও শোষণের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে ঔপন্যাসিকদের কলমে। শিল্পায়নের ফলশ্রুতিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলো ভারতবর্ষে এলেও গ্রামের মানুষেরা দরিদ্রতাকে মুছে ফেলতে পারেননি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল গ্রামের সাধারণ মানুষ ভোগ করতে পারেননি। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেরা সর্বহারার জীবন চিত্রকে উপন্যাসের পাতায় নিয়ে এলেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের উদ্দীপনাকে উপন্যাসে মুক্ত করে তুললেন। আমরা যে নবজাগরণ পেয়েছিলাম তাও ছিল খণ্ডিত। শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের প্রথম সেন্সাস কমিশনার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র তাঁর সেন্সাস রিপোর্টে লিখেছিলেন—

"লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান ভূস্বামী শহরে নিয়ে এসেছিলো সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাদের মুখপাত্র ছিলেন 'রাজা' রামমোহন রায়। এই নবজাগরণকে অনেক সময় ভ্রমবশত 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যে শ্রেণীর লোক এতে লাভবান হয়েছিলো, তারাই আদর করে এর নাম দিয়েছিলো 'রেনেসাঁস'। যে শ্রেণীর মধ্যে এই জাগরণ এসেছিলো, তার অনপনেয় ছাপ ছিলো এই তথাকথিত 'রেনেসাঁসে'। এই জাগরণ এসেছিল প্রধানত শহরে এবং বেন্টিঙ্ক যাদের পরজীবী বলে অভিহিত করেছেন, সেই ভূস্বামীশ্রেণীর মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। এই মুৎসুদ্দি জমিদারগোষ্ঠীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিলো গ্রাম থেকে দূরবর্তী শহরে বসে শাসকগোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া। এটাই ছিলো এই 'রেনেসাঁস'-এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি পরিণতি লাভ করেছিলো শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে উক্ত পরজীবী জমিদারশ্রেণী ও ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দিদের মৈত্রীর মধ্যে দিয়ে। এই 'রেনেসাঁস' আন্দোলন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আদৌ স্পর্শ বা প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি শহরের বাইরের বিশাল বঙ্গদেশের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না এই 'রেনেসাঁস'-এর কাছে।"[৫]

এই মন্তব্য থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় শহুরে ধনী ও উচ্চবিত্তরাই ছিলেন এই রেনেসাঁর ধারক ও বাহক। ফলে গ্রাম ও শহরের বিভেদ বাড়তে থাকে । পরগাছাবৃত্তি ধীরে ধীরে শহুরে মানসিকতায় ঢুকে যেতে শুরু করল । সময় যতই এগিয়ে গেছে ততই প্রতীচ্য থেকে আমদানিকৃত ভাবনা-চিন্তা ও নগরায়নের প্রবল জোয়ার আমাদের চৈতন্যকে পঙ্গু করে দিয়ে বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক রাজনীতির সফল কর্ষণকে সম্ভব করে তুলেছে । ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা প্রতীচ্যায়নের মরু বালুরাশিতে পথ হারিয়ে ফেলেছে । পঞ্চাশের 'কৃত্তিবাস' ও ষাটের 'হাংরি জেনারেশন'-এর পর ঐ দশকেই গড়ে ওঠা 'শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পে'-র ধারাও বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হয়েছিল । এই ধারাতে সামাজিক দায়বোধ চরমভাবে অস্বীকৃত হয়েছিল । এর পরেই বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্যে ইউরোপ-আমেরিকার না-সংস্কৃতির বেনোজল বৈদ্যুতিন মাধ্যমের আশীর্বাদে (!) আমাদের ড্রইংরুমে এসে প্রবেশ করতে শুরু করলো । আমাদের 'মা' হয়ে গেলেন 'মাম্মি' আর জীবিত 'বাবা' হয়ে গেলেন 'ড্যাড'। তবু ঐতিহ্যের প্রবাহটি মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়াই একমাত্র সত্য নয়। নতুন উপনিবেশবাদী চক্রান্ত এবং আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির কূটকৌশল যতই সমাজকে অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিক না কেন, নান্দনিক সংবেদনশীলতার গভীর স্তর থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টাও ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। যখন বিশ্বপুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে প্রতীচ্যের তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশগুলো আধুনিকোত্তরবাদী (Postmodernist) চিন্তার স্রোতে প্রবেশ করছিল—একই সঙ্গে সেই স্রোত সাংস্কৃতিক মাধ্যমে গৃহীত ও বিতর্কিত হচ্ছিল—তখন বাঙালির মননেও উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষী চেতনা সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, এবং চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হচ্ছিল। নকশাল আন্দোলন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর, বিশেষ করে বিগত শতকের আশির দশকে, এই উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষী চেতনাকে 'উত্তরায়ণবাদী চেতনা' হিসেবে চিহ্নিত করা

যেতে পারে। এটি ছিল অখণ্ড বাঙালির নিজস্ব চিন্তাধারার একটি বিকল্প জগৎ, যা আধুনিকতা, নব্য-আধুনিকতা, কিংবা আধুনিকোত্তরবাদের সঙ্গে সরাসরি মিলে যায় না।

তথ্যসূত্র :

১। মুহম্মদ জাফর ইকবাল; মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস; প্রতীতি, বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ১৬।

২। *তদেব, পৃষ্ঠা – ৪।*

৩। তদেব, পৃষ্ঠা -২।

৪। https://bn.wikipedia.org/wiki/নকশাল।

৫। চক্রবর্তী, দীপংকর; বাংলার 'রেনেসাঁস' : মূল্যায়ন ও ফলশ্রুতি, বাংলার রেনেসাঁস, সম্পাদনা – রংগন চক্রবর্তী, অনীক, কলকাতা ৭০০০৭৩ -, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০৬, পৃষ্ঠা -- ৫।